প্রথম অধ্যায়

বাংলা ছোটগল্পের আবির্ভাব পর্বে নারীভাবনার রূপ

উনিশ শতকের শেষার্দ্ধে কথাসাহিত্যের কনিষ্ঠ শাখা ছোটগল্প নামক শিল্পরীতিটি বাংলা সাহিত্যে প্রকাশ পায়। উনিশ শতকের রেনেসাঁস প্রভাবিত পটভূমিকায় সে যুগের মানুষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধে, আত্মসচেতনতায়, আপন অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় যুক্তিবাদ ও জীবন সম্পর্কিত নূতন জিজ্ঞাসার আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। জীবনের পুরানো মূল্যবোধগুলি যখন পারিপার্শ্বিকের চাপে বিনষ্ট হয়ে যায়, প্রকাশব্যাকুল ব্যক্তিচেতনার সঙ্গে রক্ষণশীল সমাজচেতনার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, যখন ব্যক্তি প্রচলিত রীতি ও সংস্কারকে দেবতাজ্ঞানে আর পূজা করতে পারে না, তখনই ব্যক্তির হৃদয় থেকে ধ্বনিত হয় আর্ত জিজ্ঞাসা। মানব মনের এই দ্বন্দ্বযুক্ত জিজ্ঞাসা ছোটগল্পের শিল্পমাধ্যমে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। মানবজীবনে কোনো ফলবান খণ্ডমুহূর্তের রূপায়ণ ও সেইসঙ্গে একটি তীক্ষ্ণ জীবন জিজ্ঞাসা নিয়েই ছোটগল্পের আবির্ভাব হয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে চিন্তাভাবনার ধারা বদলাতে শুরু করে। হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠা (১৮১৭ খৃ.), ইংরাজী শিক্ষার প্রসার, বাংলা ভাষায় সাময়িকপত্র ও সংবাদ-পত্রের প্রকাশ বাঙালীর চিন্তার জগতে আলোড়ন তোলে। আবার রামমোহন, বিদ্যাসাগরের শিক্ষা ও সামাজিক সংস্কার এবং প্রগতিশীল ভাবনা আমাদের বদ্ধ সামাজিক জীবনে বৃহৎ সমুদ্রের স্রোত সঞ্চার করে। এই পরিবর্তনের প্রভাব পড়ে বাংলার নারীসমাজে। নবজাগরণের ফলে সতীদাহ রোধ, স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার, নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা, বাল্যবিবাহ রোধ, বিধবাবিবাহ প্রচলন প্রভৃতি নানা সংস্কার ও আন্দোলন এ সময় প্রাধান্য পায়। এভাবে সমাজের প্রচলিত সকল

অসামঞ্জস্য , বাস্তবের বৈষম্য , প্রচলিত পুরোনো বিশ্বাস ও সংস্কারকে আঘাত করেই আধুনিক ভাবনার আবির্ভাব ঘটে । একদিকে সমাজ সংস্কার , অপরদিকে ব্যক্তির আদিম হৃদয়বৃত্তির দ্বন্দ্ব সাহিত্যে অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে । এভাবেই 'আখ্যান' থেকে 'উপন্যাস' , 'গল্প' থেকে 'ছোটগল্প' নামক শিল্পরীতির সৃষ্টি হয় ।

কোনো শিল্পসৃষ্টিকেই সুনির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞায় বাঁধা যায় না । তাই আজও ছোটগল্পের স্বয়ংসম্পূর্ণ সংজ্ঞা আমরা পাইনি । তবে গল্পসাহিত্যের প্রথম দার্শনিক Brander Mathews -এর ছোটগল্প সম্পর্কিত সার্থক সংজ্ঞাটি হল -- 'The short story by its effects , a certain unity of impression which set it apart from other kinds of fiction '' (পৃঃ ১৭২ , সাহিত্যে ছোটগল্প , নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়) । এরপর ১৯৫৬ সালে বাংলা ছোটগল্পের সর্বজনবোধ্য , বহুজনসমাদৃত সার্থক সংজ্ঞাটি আমরা পাই , যা হল -- ''ছোট গল্প হচ্ছে প্রতীতি (impression)-জাত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্যকাহিনী যার একতম বক্তব্য কোনো ঘটনা বা কোনো পরিবেশ বা কোনো মানসিকতাকে অবলম্বন করে ঐক্য - সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে ।'' (পৃঃ ১৭৩ , সাহিত্যে ছোটগল্প , নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়) । এতে উদ্ভাসিত হবে অনুভূতির সংকটময় মুহূর্ত । এই সংকটের ব্যঞ্জনাতেই আধুনিক যুগ ও জীবনের জটিলতাকে প্রকাশ করে ছোটগল্প ।

গল্প-সাহিত্য আলোচনায় দেখা যায় আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে সংবাদপত্র ছোটগল্প প্রকাশের পথকে ত্বরান্বিত করেছে । বাংলা সাহিত্যেও পত্রিকার স্থান সংকুলান প্রয়োজনে ছোটগল্পের প্রকাশ ঘটেছে । এভাবে একদিকে উনিশ শতকের যুগচেতনা ছোটগল্পের ভাবসত্যকে রচনা করেছে , অপরদিকে সংবাদপত্র তার শিল্পরূপ গঠন করতে সাহায্য করেছে । ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবে আধুনিক বাংলা

সাহিত্যে টেল্ (tale) বা উপাখ্যান জাতীয় গল্প আবির্ভূত হয়েছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগে লেখা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৭ - ১৮৯৪) 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৭) - এর সূচনা আমরা পাই। এ গ্রন্থে কর্ন্টারের 'রোমান্স অব্ হিস্টরি - ইন্ডিয়া' থেকে গৃহিত দুটি কাহিনী 'সফল স্বপ্ন ও 'অঙ্গুরীয় - বিনিময়' রয়েছে। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'-এ ইতিহাস কাহিনীকে লেখক নিজস্ব কল্পনায় বিশেষ পরিণতি দান করেছেন। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' গঠনকৌশলের দিক থেকেই শুধু সে যুগে অভিনব ছিল না, আঙ্গিকের দিক থেকেও যথেষ্ট অগ্রসর ছিল। এই কাহিনীর গঠনকৌশল অত্যন্ত ঘনপিনদ্ধ। দিল্লীর মধ্যেই ঘটনা আবর্তিত হয়েছে, স্বগতোক্তির সাহায্যে চরিত্রগুলির অন্তর যেমন চিত্রিত হয়েছে, তেমনি ঘটনার স্রোতও পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৮৯৪) আবির্ভাবের পর বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস সুপ্রতিষ্ঠিত হল। তখন 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' কালের নিয়মেই পাঠকচিত্ত থেকে দূরে সরে গেল। কিন্তু পাঠকের গল্পতৃষ্ণার তৃপ্তি হল না। এরপর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদর্শন পত্রিকার জন্য নারীর জীবনকেন্দ্রিক তিনটি ছোটো উপন্যাস বা গল্প - 'ইন্দিরা' (১৮৭৩), 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪), ও 'রাধারাণী' (১৮৭৫) লিখেছিলেন। বঙ্কিমের উপন্যাসের নামকরণে মেয়েরা প্রাধান্য পেয়েছে। 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী' ইত্যাদি উপন্যাসে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে -- সে যতই সামান্য ইতিহাস থাকুক -- নারীর কথা বলা হয়েছে, নারী মুখ্য হয়ে উঠেছে ঘটনাজালে। পরে উপন্যাসের অবয়ব ছোট হয়ে আসে পত্রিকার পাঠকের কারণে। সেই ক্ষুদ্রাকৃতি উপন্যাসে সমাজ প্রেক্ষাপটে সমসাময়িক কালের ভাবনায় নারী চরিত্র অঙ্কিত হল। 'রাধারাণী', 'রজনী', 'ইন্দিরা' প্রভৃতি উপন্যাসের নামচরিত্র নারী। তাদেরই সুখ-দুঃখ মিশ্রিত জীবনকাহিনী উঠে এল ক্ষুদ্র পরিসরে। ধীরে ধীরে ছোটগল্প লেখা শুরু হল। পত্র-পত্রিকার প্রয়োজনে গল্প লেখা শুরু হয়েছিল। প্রথমদিকে দীর্ঘ পূর্ণাঙ্গ কাহিনীগুলিকে লেখকরা 'উপন্যাস' বা 'ক্ষুদ্র উপন্যাস' বলতেন। তবে এই ছোট অবয়ব থেকেই নূতন শিল্পরীতি 'ছোটগল্প'-এর সম্ভাবনা জেগে উঠেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর সম্পাদকদ্বয় সজনীকান্ত দাস ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বলেছেন -- ''ইন্দিরা বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প রচনা

পরীক্ষার প্রথম ফল।'' এর আর একটি বৈশিষ্ট্য নারীকে কেন্দ্র করে ক্ষুদ্র অবয়বের কাহিনী তথা উপন্যাসের রূপ পেল।

'ইন্দিরা' উপন্যাসটি ১৮৭৩ সালে প্রথম পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়। নৈহাটি কাঁঠালপাড়ায় 'বঙ্গদর্শনে' ছাপা এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল মোট ৪৫। এর আগে 'ইন্দিরা' বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ১২৭৯ বঙ্গাব্দে চৈত্র সংখ্যায় প্রথম একবার প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতাবস্থায়ই এর পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কিন্তু মৃত্যুর আগের বছর অর্থাৎ ১৮৯৩ সনে 'ইন্দিরা' গ্রন্থটিকে প্রচুর সংস্কার ও পরিবর্ধিত করে ১৭৭ পৃষ্ঠায় নিয়ে আসেন। প্রথম সংস্করণের আটটি পরিচ্ছেদ বিবর্ধিত হয়ে পঞ্চম সংস্করণে একুশটি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত হয়। ইংরাজী সাহিত্যের ন্যায় এই উপন্যাসেও নায়িকা নিজের মুখে কাহিনীটি বলে গেছে। প্রথম সংস্করণে প্রকৃতপক্ষে ইন্দিরা, উপেন্দ্র ও হারাণী দাসী ছাড়া আর কারও চরিত্রই পরিস্ফুট নয়। পঞ্চম সংস্করণে কাহিনীতে কামিনী, কৃষ্ণদাসবাবু, হেনা, সুভাষিণী, রামণী, হারানী, রতনবাবু -- ইত্যাদি কত ছোটবড় চরিত্রের ভিড়। প্রথম সংস্করণে ঘটনা কম, সংক্ষিপ্ত, কাহিনীর গতি দ্রুত। স্থির লক্ষের দিকে দ্রুতগতিতে কোনো বাইরের ঘটনায় ভ্রুক্ষেপ না করে কাহিনী চলেছে -- একমুখিনতাই এর বৈশিষ্ট্য। শুধু উপেন্দ্র ও ইন্দিরার কাহিনী বঙ্কিমের লক্ষ। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এই ধরণের কাহিনীর গঠন আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করিনি। 'ইন্দিরা'র একমুখিতা, চরিত্রের বিরলতা, ঘটনা সংক্ষিপ্তি ও দ্রুতগতি -- একাধারে এতগুলি বৈশিষ্ট্য অন্য কোনো শিল্পরূপের মধ্যে আমরা পাইনি।

পঞ্চম সংস্করণের 'ইন্দিরা'র গঠনের সঙ্গে আবার তুলনা করলে তা আরও স্পষ্ট হবে যে লেখকের দৃষ্টি এখানে খুঁটিনাটির প্রতি। শ্বশুরবাড়ি যাত্রাকালে ইন্দিরার বর্ণনা -- ''আমি যাইতেছি কাঁধে, তাহারা কাঁধে বহিতেছে।'' পাল্কীবাহকদের প্রতি ইন্দিরার এই

সহানুভূতি প্রথম সংস্করণে ছিল না। কারণ সেখানে ইন্দিরার সময় বড় কম, ঘটনা দ্রুত। পরবর্তী সংস্করণে কাহিনী ধীর। ডাকাতের বর্ণনা, বনের বর্ণনা, নদীর বর্ণনা সব আছে। প্রথম সংস্করণে ইন্দিরার সঙ্গে তার স্বামীর সাক্ষাৎ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমান সংস্করণে বৈষ্ণব-নায়িকার মতো ধীরে ধীরে অনুরাগ, অক্ষেপানুরাগ, রসোদগার কেশসজ্জা ও ভাবসম্মিলন। ইন্দিরা যখন ছোট ছিল তখন সে স্বামীকে পেতে চেয়েছে এবং ফিরে পাওয়ায় তার তৃপ্তি। কিন্তু বড় ইন্দিরার তৃপ্তি কীভাবে সে স্বামীকে পেল; তার চাতুর্য, তার কুশলতা তাই বর্তমান সংস্করণের প্রাণ। অর্থাৎ বর্তমান ইন্দিরা পল্লবিত। এই কাহিনীর প্লট অবশ্য 'কল্পিত'। মিলনান্ত কাহিনীর প্রস্তুতি যেন কাহিনীর গোড়া থেকেই। গোড়ার দিকে ইন্দিরার আনন্দ চপল কথাবার্তা, অতি দুঃখের সময়েও তার চাঞ্চল্য থেকে ভ্রষ্ট হয়নি -- বরং তার কৌতুকপরায়ণ মনোভঙ্গি তার বিপদগুলিকে রোমাঞ্চকর আনন্দেই পর্যবসিত করেছে। প্লট সরল, এবং প্লটটিতে কাহিনী শেষ পর্যন্ত পাঠককে তৃপ্ত করে। কাহিনীর শেষ অতর্কিত নয়, প্রত্যাশিত; রূপকথার বা আখ্যানকের মতো। তবুও এই যুগে এর চেয়ে ভালো প্লটগঠনের কুশলতা আর কেউ দেখাতে পারেন নি।

বলা বাহুল্য, বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ইন্দিরার মাধ্যমেই প্রথম এই পদ্ধতিতে কাহিনী বলার রীতি প্রবর্তন করেছিলেন। ইন্দিরা নিজমুখে ভাগ্যজয়ের কথা বলেছে। নীতিবেত্তা বঙ্কিম সেদিনের অবস্থাপন্ন 'বাবু'-রা পাচিকা পরিচারিকাদের কিরূপ দৃষ্টিতে দেখত, বাবুদের নৈতিক আদর্শের একটা দিক উপন্যাসের আড়ালে বর্ণনা করেছেন। ইন্দিরার স্বামী উপেন্দ্র শহুরে ভাগ্যান্বেষী -- কমিসেরিয়েটের কাজে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। গল্পের কাহিনী মোটামুটি গার্হস্থ্য হলেও আসলে রূপকথার মতো হারামণির অন্বেষণ অভিযান। প্লটে জটিলতা নেই। ছোট 'ইন্দিরা'য় কাহিনী একই, তবে বেশ কিছু পরিবৃদ্ধি ও কিছু পরিত্যাগ আছে। তবে লঘু 'ইন্দিরা'র চেয়ে বৃহৎ 'ইন্দিরা' সুখপাঠ্য। পরবর্তীকালে 'ইন্দিরা' উপন্যাসের বৃহৎ ক্যানভাস

কীভাবে পেয়েছে সেটি অন্য আলোচনার বিষয়। কিন্তু প্রথম 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার জন্য লিখিত ও প্রকাশিত 'ইন্দিরা' ছোট অবয়বে পূর্ণাঙ্গ কাহিনী বলার যে ধারা চালিত হল তা নূতন সাহিত্য-শাখা উদ্ভবের পটভূমি হিসাবে বড় ভূমিকা পালন করেছে, এটিই আমার আলোচনার মুখ্য বিষয়। সেই সঙ্গে নারী মুখ্য চরিত্র হওয়ায় ছোটগল্প নিজস্ব শিল্পরূপ পাওয়ার প্রাক্ মুহূর্তে নারীভাবনার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

'ইন্দিরা' প্রকাশিত হবার ঠিক একমাস পরে 'যুগলাঙ্গুরীয়' বঙ্গদর্শনে ১২৮০ বঙ্গাব্দে বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এটি ১৮৭৪ সনে উপন্যাস আকারে যখন পুস্তকাকারে বের হয় তখন এর পৃষ্ঠা ছিল ৩৬। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালেই এর যখন পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৯৩ সনে তখন পৃষ্ঠা সংখ্যা বেড়ে হয় ৫০। ধনী সম্প্রদায়ের কন্যা হিরন্ময়ী ও শচীসুতের পুত্র পুরন্দরের প্রেমকাহিনী। অনেক বাধা বিপত্তি ও পরীক্ষার পর উভয়ের মিলনাত্মক পরিণতিতে কাহিনী সমাপ্ত। আয়তনের দিক থেকে 'যুগলাঙ্গুরীয়' ছোট 'ইন্দিরা'র সমগোত্র। অর্থাৎ পত্রিকার প্রয়োজনে 'ক্ষুদ্র উপন্যাস' লেখা ও প্রকাশ চলতেই থাকে। এখানেও প্রেমকাহিনী বর্ণিত হওয়ায় নারীর ভূমিকা রয়েছে।

'রাধারাণী' (১৮৭৭) নামক বড়ো গল্পে রাধারাণীর সঙ্গে রুক্মিণীকুমারের প্রেম ও তার বহু বাধাবিঘ্নতার অবসানের মধ্য দিয়ে মিলনের কাহিনী রচিত হয়েছে। এখানে একটি বালিকার বাল্যপ্রেম কীভাবে সফলতা পেয়েছে সেই সহজ সরল কাহিনী প্রকাশিত। তবে নারীর কথাই মুখ্য হয়ে উঠেছে।

এই গল্পগুলিতে নারীর জীবন জিজ্ঞাসা প্রাধান্য না পেলেও বঙ্কিমচন্দ্রের ঘটনাবাহুল্য বর্জিত স্বল্প চরিত্রের কাহিনী বিশিষ্ট এই গল্পগুলি পরোক্ষভাবে ছোটগল্প সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত করে তোলে কারণ এই প্রেরণাতেই পরবর্তীকালে বহু গল্প লিখিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের উক্ত ছোট উপন্যাসগুলি প্রকাশপর্বে পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'মধুমতী' নামে একটি গল্প লেখেন যা ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এটি উপন্যাস হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল। যদিও এ গল্পে লেখক চরিত্র সৃষ্টির চেয়েও ঘটনা ও ঘটনার প্রতিবেদন তৈরীর প্রতি বেশী জোর দিয়েছেন। এডগার অ্যালান পো গল্পে এই প্রতিবেদন সৃষ্টি করাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। পূর্বের আলোচিত গল্পগুলোর সঙ্গে 'মধুমতী'র এখানে পার্থক্য পাই। ছোটগল্পের স্বল্প আয়তনের দরুণ গল্পের প্রথম থেকেই প্রতিবেদন তৈরীর পরিবেশ রচনা করতে হয়। 'মধুমতী' গল্পে মধুমতী নদীর তীরে এই গল্পের পটভূমি গড়ে উঠেছে। নদীর তীর গল্পটিকে ঐক্য দিয়েছে। গল্পের প্রথমদিকে মধুমতী তীরের শান্তরূপ ও পরে জ্যোৎস্না রাত্রিতে তার উদাসী রূপ 'মধুমতী' গল্পের ঘটনাগুলিকে এক ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করেছে; মধুমতীর মনের অবস্থাও তাই। তার মনেও আনন্দের মধ্যে বিষাদভাব ও রহস্যময়তা ঘনিয়ে উঠেছে। প্লটের সারল্য, ঘটনার অতিনাটকীয়তা ও চরিত্রের রহস্যময়তা এ গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যদিও টেনিসনের 'ইনোক আর্ডেন' (enoch arden - ১৮৬৪) নামক আখ্যান-কাব্যের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত হওয়ায় 'মধুমতী' গল্পটি মৌলিকতার দাবীমুক্ত। তবুও ছোটগল্পের যথার্থ ভাব-পরিবেশ ও ঐক্যস্থাপন করার প্রয়াস লক্ষিত হওয়ায় ছোটগল্প প্রকৃত শিল্পরূপ পাওয়ার প্রাক্ মুহূর্তের গল্প লেখার ধারায় এই গল্পটি উল্লেখযোগ্য। এতে প্রেম নিয়ে নারীর হৃদয়ের নীতির সঙ্গে সামাজিক নীতির দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে। একসময়ে মধুমতী নদীতে নৌকাডুবির ফলে আদরিণী ও তার স্বামীর জীবন বিপন্ন হয়। নদীতীরে অচৈতন্য আদরিণীকে এক ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী চিকিৎসক করালীপ্রসন্ন কুড়িয়ে পায়। তার চিকিৎসাতে মেয়েটি প্রাণ ফিরে পায়

। কিন্তু দুর্ঘটনায় মেয়েটির স্মৃতিশক্তি হারিয়ে যায়। সে কে, কোথায় ছিল, বিবাহিতা কিনা -- কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারে না। ফলে এই বাইশ বছরে রূপসী ভুবনমোহিনী রমণীর সঙ্গে পঁচিশ বছরের যুবক করালীপ্রসন্নের বিবাহ হয়। করালী মেয়েটির নূতন নাম দেয় 'মধুমতী'। এই নববিবাহিত স্বামীর প্রতি প্রেমে, শ্রদ্ধায়, কৃতজ্ঞতায় মধুমতীর জীবন মধুময় হয়ে ওঠে। এমন সময় একদিন রাতে মধুমতী তার বহুদিনের পুরানো একটি গান 'আদর তরঙ্গ বহে রূপের সাগরে' শুনতে পায়। প্রথম স্বামীর কণ্ঠের এই পুরানো গান শুনে মধুমতীর মনে পড়ে যায় তার নাম ছিল আদরিণী ; সে বিবাহিতা। এভাবে তার বর্তমানের সুখী দাম্পত্য জীবনে তীব্র সংকট ঘনিয়ে আসে। অস্থির হৃদয়ে মধুমতী করালীপ্রসন্নকে সব ঘটনা জানায়। সধবা নারীকে বিবাহ করে করালীও ধর্মভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ে। ফলে সে মধুমতীকে তার বিবাহিত জীবন থেকে মুক্তি দেয় ; কিন্তু মধুমতীর মনের আলোড়ন তাতে কমে না। একদিকে প্রথম স্বামীর স্মৃতি ; অপরদিকে করালীর প্রতি তার সদ্য জাগ্রত গভীর ভালোবাসা -- এই দুয়ের টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ওঠে তার নারীহৃদয়। প্রথম স্বামী তাকে পুনরায় সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু দুই পুরুষের প্রতি প্রেমে দ্বিধা বিভক্ত মন নিয়ে মধুমতীর পক্ষে সংসার করা আর সম্ভব হয় না। তাই সে পূর্ব স্বামীর কাছে ফিরে যায় ও মধুমতী নদীর জলে উভয়ে প্রাণ বিসর্জন দেয়। আমাদের সমাজে সধবা নারীর দ্বিতীয় বিবাহ সামাজিক জীবনে ও নারীর ব্যক্তিগত জীবনে যে তীব্র অস্তিত্ব সংকট ঘনিয়ে তোলে মধুমতী চরিত্রে সেই বিপর্যয় ফুটে উঠেছে। লেখক মধুমতীর জীবনের এক সংকটময় পরিস্থিতিকে এই গল্পের কাহিনীতে ধরতে চেয়েছেন। ছোট অবয়বে আদরিনী নাম্নী নারীটি একটি দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্মৃতিভ্রস্ট হওয়ায় আবার বিবাহের মাধ্যমে নূতন জীবন শুরু করে। কিন্তু প্রথম স্বামীর গানের মধ্য দিয়ে প্রথম জীবনের স্মৃতি ফিরে আসায় নূতন বিবাহিত জীবনের মধুময়তা নষ্ট হয়ে জটিল মানসিক সংকটে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে গিয়ে উভয়ের আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়ে জীবনের জটিল আবর্ত থেকে মুক্তি পায়। মধুমতী বা আদরিণীর এই পরিণামটি অনিচ্ছাকৃত ঘটনাধারায় ঘটেছে।

স্মৃতিভ্রষ্ট হওয়ায় এবং নৌকাডুবির কারণে সধবার কোন চিহ্ন না থাকায় কুমারী হিসাবেই পরিচিত হয় এবং যথানিয়মে বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করে। কিন্তু স্মৃতি ফিরে পাওয়ায় আবার বিপদ ঘনিয়ে আসে। হিন্দু নারীর আদর্শ অনুসারে মৃত্যু ছাড়া তার কাছে আর কোন পথ উন্মুক্ত ছিল না।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'ভ্রমর' পত্রিকায় ১২৮১ সালে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'দামিনী' ও 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' নামে দুখানি গল্প লেখেন। 'দামিনী' গল্পের শুরুতেও 'মধুমতী' গল্পের মতো পাঠকচিত্তে কৌতূহল সৃষ্টির পরিবেশ রচিত হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণনায় পাই -- ''বহুদিন হইল একদিন সন্ধ্যার সময় সপ্ত বৎসর বয়স্কা একটি বালিকা ভাগীরথী তীরে দাঁড়াইয়া অনিমেষ লোচনে স্রোততাড়িত দীপশালা দেখিতে দেখিতে পশ্চাদ্বর্তিনী এক বৃদ্ধাকে বলিল ; আই ! আমার দীপ ভাসিয়া গেল।'' দামিনী সাত বছর বয়সের একটি বালিকা। সংসারে বৃদ্ধা মাতামহী ছাড়া তার কেউ ছিল না। বিবাহের পর দুর্বৃত্তের দল তাকে তুলে নিয়ে গেলে 'কলঙ্কিতা' বলে শ্বশুরবাড়ি থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। ফলে সংসারের অকুল-অন্ধকার সাগরে দামিনীর জীবনদীপ ভেসে যায়। গল্পের অপর নারী চরিত্র দামিনীর মাতামহী প্রবল শোকে তিনি পাগল হয়ে যান। অবশেষে উভয়েরই ভয়াবহ মৃত্যু হয়। অত্যাচারীর হাতে দুর্বলা নারীর লাঞ্ছিত করুণ মর্মান্তিক পরিণতি এ গল্পে চিত্রিত। সমাজ ও পরিবারের মানুষ যে নারীর প্রতি চির উদাসীন, এবং তাদের উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখে, এ গল্পে তা ফুটে উঠেছে। দস্যুবৃত্তি, নারী লুণ্ঠন, নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ ও অন্যায় আচরণ, একাধিক হত্যা ও মৃত্যু -- এই সমস্ত উত্তেজিত ঘটনার ফলে 'দামিনী' গল্পে বীভৎস রসের সঞ্চার হয়েছে। কাহিনীতে অবান্তর প্রসঙ্গ ও চরিত্র সৃষ্টি গল্পটিকে রসগ্রাহী হতে দেয়নি। যেমন রমেশচন্দ্র নামে এক প্রতিবেশীর ভণ্ডামী ও বীরত্বের মিথ্যা আস্ফালন ও তার সুদীর্ঘ ভাঁড়ামি মূল কাহিনীর ঐক্য বিনষ্ট করেছে। নারীর জীবনের অসহায়তা, দুঃসহ লজ্জা ও অপমানের মধ্যেই এ গল্পের বিষয়বস্তু

নিহিত। শেষ পর্যন্ত কোনো বিশেষ ঘটনা বা চরিত্রের উপর এখানে জোর পড়েনি। এ গল্পেও প্রধান হয়েছে একটি ভাব বা প্রতিবেদন।

'দামিনী' গল্পের তিনবছর পরে ১২৮৪ সালে এ ধরনের আর একটি গল্প রবীন্দ্রনাথের 'ভিখারিণী' প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোটগল্প হিসাবে এর ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়া অন্য কোনো মূল্য নেই। এর কাহিনীতে বর্ণনার প্রাধান্য প্রকাশিত। কাহিনীর সূচনা এবং শেষ বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষুদ্র কাহিনীগুলির আঙ্গিকের মতো উপকথাধর্মী। যেমন -- ''কাশ্মীরের দিগন্তব্যাপী জলদস্পর্শী শৈলমালার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটিরগুলি আঁধার আঁধার ঝোপঝাপের মধ্যে প্রচ্ছন্ন। ..... এই গ্রামে দুইটি বালক বালিকার বড়ই প্রণয় ছিল। ..... পৃথিবীর মধ্যে তাহার আর কেহই ছিল না, কেবল একটি বিধবা মাতা ছিল আর স্নেহময় অমরসিংহ ছিল।''

'মধুমতী', 'দামিনী' ও 'ভিখারিণী' -- এই তিনটি গল্পের কাহিনীতে এডগার অ্যালান পো কথিত tale-এর সাদৃশ্য পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা', 'যুগলাঙ্গুরীয়' ও 'রাধারাণী' থেকে এখানে পার্থক্য নিহিত। কারণ বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্ট কাহিনীগুলি রূপকথার মতোই অসম্ভব সম্ভাবনাকে সম্ভব করে মিলনাত্মক পরিণতি রচনা করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের গল্পে প্লটের কুশলতাও যথেষ্ট নয়। তবে কাহিনীর আকর্ষণ, বিশেষত ইন্দিরার বাক্-চাতুর্য সেকালে বাঙালীমনকে কিছুটা তৃপ্ত করেছিল। তবে 'মধুমতী', 'দামিনী' ও 'ভিখারিণী' বাংলা গল্পের ইতিহাসে এক পদ অগ্রসর হয়েছে। গল্পের লক্ষ্য এখানে শুধু কাহিনীতে নয়, কাহিনীর চেয়েও বিশেষ ভাব বা প্রতিবেদন সৃষ্টি বড় হয়ে উঠেছে। বঙ্কিম কাহিনীতে নারী প্রধান চরিত্র। তবে তারা জীবনে সুখে-সম্পদে তৃপ্ত, আর অন্য গল্পগুলিতে নারী প্রাধান্য পেলেও তারা জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত, তাদের জীবনে

নারীত্বের অসহায় বেদনার ছাপ প্রবল ও মৃত্যুতে কাহিনী সমাপ্ত। তিনটি গল্পের বিষয় প্রেম। গল্পগুলির পটভূমি মুক্ত প্রকৃতি। প্রথম দুটিতে নদী, শেষটিতে কাশ্মীরের পাহাড়ী উপত্যকা। সাধারণভাবে বলা যায় 'মধুমতী', 'দামিনী' ও 'ভিখারিণী' -- এই তিনটি গল্পই কোনো না কোনো ভাবে অ্যালান পো-র আখ্যানধর্মকে অনুসরণ করেছে।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ললিত-সৌদামিনী' গল্পটি ১২৮৮ সনে 'জ্ঞানাঙ্কুর' ও 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় অগ্রহায়ণ-মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই গল্পটিও উল্লেখযোগ্য, কারণ, নারীর স্বাধীনতাকে এ গল্পে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নয়টি অধ্যায়ে রচিত এই দীর্ঘ কাহিনীর বিষয়বস্তু ললিত ও সৌদামিনীর প্রণয় ও পরিণামে বিবাহ। ললিত ও সৌদামিনী একে অপরকে ভালোবাসে, কিন্তু কৌলিন্যের সংস্কারে সৌদামিনীকে ললিতের সঙ্গে বিবাহ দিতে রাজী হলেন না তার বাবা বামনদাস। সৌদামিনীর মা সাবিত্রী সে যুগেও সংস্কারের উর্দ্ধে উঠে মেয়ের মনকে উপলব্ধি করেছিলেন, তাই তিনি ললিতকে প্রশ্রয় দিতেন। ললিত অসুস্থ সৌদামিনীকে দেখতে আসত, সেই সূত্রেই তাদের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার হয়। সৌদামিনীর বাবা রামকানাই নামে এক প্রৌঢ় পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিতে চান। কিন্তু সৌদামিনী সে বিবাহ করে না। পরিণতিতে ললিত ও সৌদামিনীর বিবাহ হয়। এই সহজ সরল কাহিনীতে প্লটের কোনো জটিলতা নেই। চরিত্রগুলি স্পষ্ট ও পরিচিত। অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে লেখক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। তবে প্রধান চরিত্রের চেয়ে পার্শ্বচরিত্রগুলি ও পার্শ্বঘটনাগুলিই এ গল্পে অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে ওঠায় ছোটগল্পের ভাব-ঐক্য বিনষ্ট হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী যে দু'জন গল্পকারের লেখায় নারীর জীবন-ভাবনার পরিচয় পাই তাঁরা হলেন স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) ও নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪৯)। বিশেষতঃ লেখিকা হিসাবে

স্বর্ণকুমারী দেবীর ছোটগল্পে নারীর জীবন-যন্ত্রণা , তার সমস্যা ও জটিলতা অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে , সুস্পষ্টরূপে , গভীর সহানুভুতি ও সহমর্মিতার সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে । বিশেষতঃ স্বর্ণকুমারী দেবীর গল্পে নারীর দৃষ্টিতেই সমস্ত চরিত্র বিশ্লেষিত হয়েছে । যে সমস্ত গল্পে মেয়েদের মান-অভিমান-প্রেম-প্রীতিতে আত্মবলিদানের উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হয়েছে সেগুলি হল -- 'মালতী' (১২৮৬) , 'সন্ন্যাসিনী' , 'কেন ?' (১২৯৮) , 'লজ্জাবতী' (১২৯৮) , 'গহনা' , 'যমুনা' , 'পেনেপ্রীতি' (১৩০৬) , 'অমরগুচ্ছ' (১৩১৫) , 'চাবিচুরি' , 'পূজারতত্ত্ব' (১৩২১) , 'তিনটি দৃশ্য' , 'বিজয়ার আশীর্বাদ' ইত্যাদি ।

স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম গল্পের বই ১৭ই আগস্ট ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় । তিনি গল্পগ্রন্থের নাম দেন 'নবকাহিনী বা ছোট ছোট গল্প' । অর্থাৎ লেখিকা যেন নিজের নূতন ধরনের সৃষ্টি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন । তাঁর প্রথম বড় গল্প 'মালতী' ১২৮৬ বঙ্গাব্দে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । এতে মালতী নামে একটি অনাথা অসহায়া কিশোরী কন্যার করুণ ব্যর্থ জীবন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে । শৈশবে মাত্র একবছর বয়সকালে মালতীর মা মারা যায় । তার মার বান্ধবী রমেশের মা তখন থেকেই তাকে নিজের কন্যার মতো বড়ো করে তোলে । রমেশের মার ইচ্ছা ছিল মালতীর সঙ্গে পরবর্তীকালে রমেশের বিবাহ দেবার । কিন্তু অকালে রমেশের মা-ও মারা যায় । সেই থেকে রমেশের স্নেহচ্ছায়ায় ভাই-বোনের মতো প্রেমমধুর সম্পর্কে মালতী বেড়ে ওঠে । মালতী এখন চতুর্দশ বর্ষীয়া বালিকা , সে জ্যোৎস্নাময়ী প্রতিমা । শিশুকাল থেকে মালতী রমেশকে নিজের দাদা জেনে ভালোবেসে এসেছে । কিন্তু রমেশের বিয়ের আগে সে জানতে পারে রমেশ তার নিজের কেউ-ই নয় । বিবাহ পরবর্তী-কালে রমেশের স্ত্রী শোভনা মালতীর এই নিঃস্বার্থ ভালোবাসাকে সন্দেহের চোখে দেখে । ত্রিভুজ প্রেমের জটিলতা থেকে দাদার সংসার রক্ষার্থে মালতী আত্মবিসর্জন করে । আমাদের সমাজে একসময় অনাথা যুবতী নারীকে একা বাঁচবার অধিকার , মর্যাদা ও স্বাধীনতা দেওয়া হোত না । তাই রক্ত-সম্পর্কহীন মানবিক সম্পর্ক এ গল্পে শেষপর্যন্ত

বড়ো হয়ে উঠল না। মালতীর আত্ম-বলিদান , দাদার ওপর বোনের সুগভীর ভালোবাসার পরিচয় বহন করে। এই দীর্ঘ কাহিনীধর্মী গল্পে ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যের বড়ো অভাব রয়েছে।

'কেন' গল্পটি ১২৯৮ বঙ্গাব্দে 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সংসারে স্বামী কর্তৃক অবহেলিতা এক সংসারী নারীর মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অন্তরের জিজ্ঞাসা 'কেন' গল্পের বিষয়বস্তু। উত্তমপুরুষে লেখা এ গল্পে প্রধান নারী চরিত্রটি একান্তভাবে পতিগত - প্রাণা। অথচ সংসার-সন্তান-সুখ ছেড়ে তার স্বামী বাইরের কোন রমণীর প্রতি আসক্ত। স্বামীর এই হৃদয়হীনতা সত্ত্বেও মেয়েটি বলে -- ''স্বামী যে ভালোবাসেন না পোড়া প্রাণে তাহাও সয়। কিন্তু তাঁহার এ অদর্শন সহে না। নিয়মিত সময়ে তাঁহার যেদিন দেখা না পাই সেদিন প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হয় , মনে হয় স্বামী আসিয়া আমাকে যদি এখন পাদুকাঘাত করেন তো ইহার তুলনায় তাহাও সুখ।'' অর্থাৎ স্বামীর বহির্মুখী-অন্যায়-প্রেমহীন আচরণ ও অপমানকে মেয়েটি মেনে নিচ্ছে এ গল্পে। সনাতনী ভারতীয় নারীর সাদৃশ্যে এ গল্পের নারী চরিত্রটি অঙ্কিত হলেও সে এখানে আত্মমর্যাদাশূন্য ও ব্যক্তিত্বহীনা। হঠাৎ করে স্বামী কেন সংসারে পুনরায় ফিরে আসে তার কারণ গল্পে সুস্পষ্ট নয়। অলৌকিক পরিবেশ , স্বপ্নদর্শন গল্পটিকে অবাস্তব ও রহস্যময় করে তুলেছে। তবে মেয়েটির শাশুড়ি চরিত্রটি বাস্তবসম্মত ও স্বাভাবিক। ঘরে লক্ষ্মীস্বরূপা স্ত্রীকে উপেক্ষা করে বাইরের নারীর কাছে যাওয়ায় ছেলেকে তিনি তিরস্কার করেছেন। আবার গল্পের পরিণতিতে ছেলের সুমতি হলে মা-এর মন আনন্দে ভরে উঠেছে। সামাজিক সংস্কার ও নিয়মের শাসনে এ গল্পে নারীর জীবন আলোড়িত।

'লজ্জাবতী' গল্পটি ১২৯৮ সালে 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত। বাঙালী সমাজের একান্নবর্তী পরিবারে ভীরু

, মুখচোরা , ব্যক্তিত্বহীনা এক বালিকাবধূর আত্মনিবেদনের করুণ কাহিনী এটি । দীর্ঘ বারো বছর ধরে লজ্জাবতী শ্বশুরবাড়ী এসেছে , অথচ তার স্বভাবই এমন বিনম্র-কোমল-মধুর-সরল ও শিশুসুলভ যে তার ওপর শত অন্যায় অত্যাচারেও সে প্রতিবাদ করতে পারেনি । নিজের কোন অধিকার ও কর্তৃত্ববোধও তার জন্মায়নি । তাই অকালে তার প্রাণনাশ হয় । লেখিকার ভাষায় ''লজ্জাবতী লতাটির মত সংকুচিত ।'' আসলে সে শিশুসুলভ সরল এক গৃহবধূ রূপে চিত্রিত হয়েছে । ফলে তার ওপর সংসারে শত সহস্র অন্যায় অত্যাচার বর্ষিত হয়েছে । লজ্জাবতীর শাশুড়ি ছোটবৌ-এর প্রতি কোনোভাবেই প্রসন্ন হতে পারেনি । আমাদের সংসারে ছেলেমানুষ-ছেলেবৌ-এর ওপর শাশুড়ির সহানুভূতিহীন অসহযোগী আচরণ এ গল্পে বাস্তবসম্মত রূপে তুলে ধরা হয়েছে । সংসারে সেবায় , কঠিন পরিশ্রমে , অবহেলায় ও অনাদরে অসুস্থ হয়ে অবশেষে অকালেই লজ্জাবতী ইহজগৎ থেকে বিদায় নিয়েছে । লেখিকা এ গল্পে দেখালেন লজ্জাবতীর অসাধারণ সহ্যশক্তির কথা , অথচ সংসারে কেউই তার মন বোঝেনি । একমাত্র ননদিনী ফুলকুমারী ছোটবৌদির ওপর অকারণ অন্যায় আচরণের দিকটি সহমর্মিতার সঙ্গে অনুভব করে বলেছেন -- '' যেখানে তোর দোষ নেই , সেখানেও কথা কোসনে ।'' দরিদ্র ঘরের কন্যা ও বালিকা বধূ লজ্জাবতীর মত নারীর সংখ্যা আমাদের দেশে বেশী । যাদের মৃত্যুকালেও মুখ ফোটেনা । 'সংকোচে বিহ্বলতায়' নিজেদের নারীত্বের অপমান যন্ত্রণাকে হাসিমুখে মেনে নেয় এসব সংসারী রমণী । আত্মোৎসর্গেই সুখী এসব নারীর হৃদয় ।

স্বর্ণকুমারীর অধিকাংশ গল্পের নারীরাই সংসারে মেনে চলতে বা মানিয়ে নিতেই অভ্যস্ত , নারীর অধিকারবোধ ও আত্মনির্ভরতার অভাব এসব গল্পে দেখি । তবে প্রতিবাদের প্রকাশও কিছু গল্পে আছে । যেমন 'যমুনা' গল্পটি । এটি একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা । যমুনা চোদ্দ বছরের যুবতী কন্যা । একসময়ে তার পিতা ধনবান থাকলেও তার অকালমৃত্যুর পর দুষ্টলোকের চক্রান্তে যমুনা ও তার মা দরিদ্রাবস্থায় পতিত হয় । দরিদ্র ও কায়স্থ বলে সমাজে

যমুনার সহজে বিবাহ হয় না। এমন সময়ে পীড়িত এক পথিক তাদের গৃহে আশ্রয় নেয় এবং যমুনাকে ভালোবেসে বিবাহ করে। কিন্তু বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি গিয়েই যমুনা উপলব্ধি করে স্বামীর ভালোবাসা মিথ্যা। স্ত্রীর মর্যাদায় নয়, দাসীরূপে যমুনাকে আনা হয়েছে। যেহেতু স্বামী জাতিতে বৈদ্য তাই নীচুবংশের যমুনার সঙ্গে তার বিবাহ যথার্থ নয়। সামাজিক এই কুসংস্কার এভাবে যমুনার জীবনকে বিপর্যস্ত করে। এমনকি স্বামীর পূর্ববিবাহিতা স্ত্রীও রয়েছে। কাজেই যাকে 'পতিদেবতা' রূপে যমুনা মনে মনে পূজা করে এসেছিল, তার এই ভণ্ডামি, হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা ও প্রতারণা যমুনার কাছে অসহ্য লাগে। তাই ছদ্মবেশী স্বামী যখন তাকে পুনরায় অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার প্রলোভন দেখায়, তখনই যমুনা তীব্র ভাষায় বলে -- ''আমাকে স্পর্শ করিও না, তুমি আমার স্বামী কিন্তু আমি তোমার পত্নী নহি -- ।'' এভাবে যমুনা সংসারের মায়া ত্যাগ করেছিল। এরপর গল্পের কথকের সঙ্গে যমুনার মধুর স্নেহের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত যমুনা আর একবার স্বামীর কাছে ফিরে গেলেও নারীত্বের অপমান সইতে পারে না ও ফিরে আসে। অবশেষে জীবিতাবস্থায় সন্ন্যাসিনী বেশে যমুনা শ্মশানে আশ্রয় নেয় এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়। যদিও তার ভবিষ্যৎ জীবন সুখের হয় না, তবু তার আত্মমর্যাদাবোধ তাকে গল্পে ব্যক্তিত্বপূর্ণ করে তুলেছে।

'গহনা' গল্পটি ১২৯৮ সালে 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ গল্পে নারীর মাতৃত্বের সংস্কার ও মানসিকতা প্রাধান্য পেয়েছে। বিহারীলাল সেনের এক পুত্র ও কন্যা নলিন ও হেমপ্রভা। ছেলেকে ভবিষ্যৎ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার আশায় তার পিতামাতা তাকে সিভিল সার্ভিস পড়তে পাঠান। এদিকে ঘরে অর্থাভাবে অসুস্থ কন্যা হেমপ্রভার মৃত্যু হয়। মেয়ের মৃত্যুতে কাতর হয়ে পড়েন নলিনের মা। এরপর প্রতিবেশীর কন্যা ভাবিনীকে নিজ মেয়ের মতো স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন এই মাতা। এমন কি মনে মনে পুত্রবধূ রূপেও কল্পনা করেন। ভাবিনীও এই স্নেহ ও আদর বোঝে। মনে মনে সেও নলিনকে স্বামীরূপে গ্রহণ করে। দুবছর পর

নলিন দেশে ফিরে আসে। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে মা ভাবিনীর হাতে পরিয়ে দেবার জন্য ছেলেকে দু-গাছি বালা দেন। কিন্তু নলিন জানায় মার এই আদেশ পালনে সে ব্যর্থ, কারণ ইংল্যান্ডেই সে তার জীবন সঙ্গিনী নির্বাচন করে এসেছে। এভাবে ছেলের মতামতের অপেক্ষা না করে নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় নলিনের মা ও তার কল্পিত পুত্রবধূ ভাবিনীর জীবনে আশাহত হবার গভীর বেদনা নেমে এসেছে।

১৩০৬ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় শ্রাবণ সংখ্যায় 'পেনেপ্রীতি' গল্পটি প্রকাশিত হয়। এতে মারাঠি কিশোরী কন্যার প্রতীক্ষাকাতর ব্যর্থ প্রেমের করুণ কাহিনী ব্যক্ত। বীজাপুর নবাব কন্যার বংশে গল্পের ফুলওয়ালিটির জন্ম। তার পিতা সিপাহী ছিলেন। তিনি মারা যাবার আগে এক ইংরেজ সাহেবের কাছে তার পরিবারের ভার দিয়ে যান। তার দিদির সঙ্গে এই সাহেবের বিবাহ হয়। এই বিজাতীয় বিবাহের ফলে সমাজে মেয়েটির পরিবার জাতিচ্যুত হয়। মেয়েটির মা তাই ছোট মেয়েটির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ভেবে সাহেবকে ছোট মেয়েটিকেও গ্রহণ করতে অনুরোধ করে। সাতবছর বয়সে মেয়েটিকে তার দিদির ইংরেজস্বামী ভবিষ্যতে বিবাহ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে যান। দশবছর ধরে সেই বিশ্বাসকেই মনে প্রাণে লালন করে গেছে মেয়েটি। নিষ্কাম নিঃস্বার্থ প্রতিদানহীন প্রেম এ গল্পে পূজার-ই নামান্তর। মারাঠি হয়েও বাঙালী মেয়ের মতই আবেগে কল্পনায় অনুভবে এই মেয়েটি ধন্য। তাই বিবাহ বা ভাব বিনিময় নয়, সামান্য ছবি পেয়েই পুলকিত উৎফুল্ল এই নারীর হৃদয়। নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগে ও প্রেমের আদর্শে বিশ্বাসী এই নিঃসঙ্গ যুবতী নারীর আচরণে লেখিকা নিজেও যেন বিস্মিত; তাই গল্পের পরিণতিতে পাঠকের কৌতূহল মিশ্রিত জিজ্ঞাসা তুলে ধরেছেন -- ''এই যৌবনবতী রূপবতী রমণী কি ঐ নির্জীব ছবিখানির দর্শনে পূজায় আপনার জ্বলন্ত জীবন্ত শতপ্রাণবন্তু অনুরাগ আকাঙ্ক্ষা চিরসমাধিস্থ করিবে? ফুলওয়ালির মুখে এরূপ কোন দুঃখের ছায়াও দেখিলাম না; প্রীতিময়ী রমণী তাহার চির আকাঙ্ক্ষিত ধনলাভেই যেন অসীম প্রীতিপূর্ণ হইয়া

অঞ্চল হিল্লোলে দিক্ দিগন্তে সে আনন্দ প্রীতি বিস্তার করিতে করিতে চলিয়া গেল।''

সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় কয়েকটি নারীচরিত্রের কথোপকথন ও মতামতের মধ্য দিয়ে 'মিউটিনি' গল্পের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। গল্প কথক একজন ভারতীয় রমণী। ইনি ইংরেজ গৃহকর্ত্রী মিসেস এ-র বাংলোতে অতিথি রূপে অভ্যাগতা। সেখানে মিসেস বি ও মিসেস সি - ও রয়েছেন। মিসেস এ -র স্বদেশ প্রেমের উজ্জ্বল গৌরবগাথা বর্ণনায় লেখিকার মনে পরাধীনতার গ্লানিবেদনা জেগে ওঠে। দেশের অতীত গৌরব স্মরণ করে তিনি দাস জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা স্বরূপ প্রাচীন আর্যগৌরব উদ্ধৃত করতে দ্বিধা বোধ করলেন না, ---- 'ঐ যে সতীস্তম্ভ, উহা আংগ্রে রাজরাণীদের -- না ?' অর্থাৎ সতীত্বের চরম পরাকাষ্ঠা হিসেবে সতীস্তম্ভ গুলি একপ্রকার বীরত্বের প্রতীক হিসাবে তিনি নির্দেশ করতে চান। রাজপুত রমণীরা যেমন পুরুষের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বীরত্বের পরিচয় দিতে সক্ষম ছিলেন, তেমনি পুরুষদের জীবনদানের পর অপর পুরুষের লুব্ধ কলুষতার হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জন দিয়ে সতীত্বকে অম্লান রাখার দৃষ্টান্তও স্থাপন করেছেন। এগুলি একদিকে যেমন সতীত্বের ধ্বজা তুলে ধরেছে, তেমনি নারীর আত্মমর্যাদা বোধকে চিরকালের জন্য উজ্জ্বল করে রেখেছে। এর মধ্যে নারীর ভয়ানক সাহসের পরিচয়ও তিনি লক্ষ করেছেন। এগল্পে এভাবে নারীর মুখে স্বদেশপ্রেমের মাহাত্ম্যকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। গল্পটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৩১৫ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ সংখ্যায় 'অমরগুচ্ছ' গল্পটি প্রকাশিত হয়। তৎকালীন সমাজের জ্বলন্ত সমস্যা বালবৈধব্যের যন্ত্রণার কথা নিজমুখে মেয়েটি এ গল্পে ব্যক্ত করেছে।

230611 31 MAR 2010
LIBRARY NBU,DARJEELING

বৈধব্যের পর বারবছর বয়সে সে পিতৃগৃহে ফিরে আসে। স্বামীর কথা তার বিশেষ মনে নেই, তবু হিন্দু রমণীর চিরাচরিত সংস্কারবশতঃ স্বামীর একটি অস্পষ্ট ফটোগ্রাফ সে স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ সঙ্গে রাখে। এভাবে যার অভাবে তার জীবন আজ শূন্য, আনন্দহীন, তাঁরই ধ্যানে সে হৃদয় পূর্ণ রাখতে চায়। এই চিরন্তন সংস্কারকে উপেক্ষা করার ইচ্ছা বা শক্তি কোনটিই মেয়েটির নেই। তাই বাস্তব সংসারে নয়, দাদা ও তার বন্ধুর সঙ্গে নৈনিতাল পাহাড়ে বিশ্বপ্রকৃতির অসীম অনন্ত সৌন্দর্যরাশির মধ্যে এই বিধবা রমণীটির মনে রোমান্টিক ভাব-ব্যাকুলতা জেগে ওঠে। কিন্তু এই ভাব ও স্বপ্নময়তা একান্ত ভাবেই তার ব্যক্তিগত। তাই ছ'মাস পর আগত সেই বন্ধুটি যখন নববিবাহিতা বধূকে পাশে নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে, তখন সে তার পূর্বের পুরানো অমরপুষ্পের স্তবক এই নববিবাহিতা বধূর হাতে তুলে দেয় প্রীতি উপহার স্বরূপ। সে রাতেই সে একটি সুন্দর স্বপ্ন দেখে - ' মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার রজনী, চারিদিকে কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। সেই ঘন ঘোর নিবিড় গহনের মধ্যে একজন দেবপুরুষ আসিয়া আমাকে তুলিয়া লইয়া শূন্যমার্গে উঠিলেন; আমরা উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধে, ব্যোম হইতে ব্যোমে ভাসিয়া চলিলাম। ভাসিতে ভাসিতে একটি অত্যুচ্চ শৈল শিখরে আসিয়া তিনি যখন আমাকে নামাইয়া দিলেন, তখন মুহূর্তে চতুর্দিকের তিমির আবরণ অপসৃত হইয়া গেল; দিক দিগন্ত বিভাসিত এক অপূর্ব আলোকে সেই দেবপুরুষ আমার নয়নে প্রতিভাত হইয়া উঠিলেন। একি ? ইনি কে ? ইনি যে আমার স্বামী দেবতা ! আমার সেই যত্ন রক্ষিত ছবিখানির যে ইনি সাকার প্রতিরূপ ! কেন তবে ইহাকে এতকাল মৃত মনে করিয়াছি !' এভাবে সে বিস্মৃত স্বামীর ছবিতেই শান্তি ও সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছে।

'পূজার তত্ত্ব' গল্পটি ১৩২১ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সুশীলা এ গল্পে মধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ গৃহবধূ। একসময়ে মথুরা যথেষ্ট পণ নিয়ে সুশীলাকে বিবাহ করলেও এ ব্যাপারে তার সন্তুষ্টি হয় না, তাই শ্বশুরের পূজার সময়ে দেওয়া তত্ত্ব নিয়ে সে স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি করে। বিবাহের পর স্বামীর লোভসর্বস্ব হীনচরিত্রে আহত হয়েছে সুশীলার কোমল নারী সত্তা।

আবার পিতৃগৃহে এরূপ স্বামীর নিন্দা শুনেও তার মন শোকার্ত হয়ে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত সংসার জ্বালা ও যন্ত্রণাতে দগ্ধ, জীবন সম্পর্কে হতাশাগ্রস্ত সুশীলাকে তার মা নারী জীবনের উদ্দেশ্য জানিয়ে বলে -- ''সহ্য করে কর্ত্তব্য পালনেই মনুষ্যত্ব। স্ত্রীলোকেরও জীবনের উদ্দেশ্য আছে। তুমি যখন তোমার ছেলেগুলিকে মানুষ ক'রে - প্রকৃত মানুষ ক'রে তুলবে - তখন তোমার জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।'' বলা বাহুল্য সুশীলা মা'র এই উপদেশকেই শিরোধার্য করে নেয় এবং বলে -- ''মা, আশীর্ব্বাদ কর -- চরণধূলি দাও, যেন তোমার আজ্ঞা পালন করতে পারি।'' এভাবে সংসার ও পরিবারের মঙ্গলসাধনেই সুশীলা এ গল্পে তার নারীসত্তাকে নিয়োজিত করে।

স্বর্ণকুমারী দেবীর 'বিজয়ার আশীর্বাদ' গল্পটিতে সামাজিক কুসংস্কারের কবলে পড়ে নারীর মাতৃত্বের সংস্কার বিপর্যস্ত হয়েছে। পাঁচটি পরিচ্ছেদে লেখা এ গল্পে ১৮৮৪ সালের সময় কালকে পটভূমি রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন দেবার মত নির্মম সামাজিক কুসংস্কারের বলি হয়েছে এ গল্পের জননী চরিত্র ক্ষেমঙ্করী। সন্তানকামনায় মৃতবৎসা এই জননী একমাত্র পুত্র সন্তানকে গঙ্গাবক্ষে বির্সজন দিয়ে গভীর শোকে উন্মাদিনী, ভৈরবী মূর্তি ধারণ করেছে। তার স্বামীও এই সংস্কারের কাছে অসহায়। আবার বিসর্জিত সন্তানটিকে কাকদ্বীপের জমিদারপত্নী নিঃসন্তান করুণাময়ীর কাছে পেয়ে পরম যত্নে মানুষ করে তোলে। বহুদিন পর আকাঙ্ক্ষিত পুত্র সন্তানের সঙ্গে জন্মদাত্রী মায়ের মহা মিলন ঘটে। সামাজিক কিছু কুসংস্কার কীভাবে নরনারীর জীবনে করুণ পরিণতি ঘনিয়ে তোলে তার বাস্তব পরিচয় লেখিকা এতে তুলে দেখালেন। তবে শেষ পর্যন্ত কুসংস্কারের কাছে মাতৃত্বের জয় বড় হয়ে উঠেছে।

'কান্তিবাবুর খোশনাম' গল্প ১৩৩০ সালে 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হয়। তিনটি পরিচ্ছেদে লেখা এ গল্পের প্রধান নারী চরিত্র শান্তি। সে উচ্চশিক্ষিতা, সংস্কৃতিমনা, যথার্থ বুদ্ধিমতী নারী। বিধবা মায়ের সঙ্গে শান্তি তার মামার বাড়ীতে থাকে। এন্ট্রান্স পরীক্ষাতে শান্তি ও তার মামাতো ভাই কান্তিচন্দ্র একসঙ্গে অবতীর্ণ হলেও নিজ প্রতিভাবলে শান্তি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়; আর কান্তিচন্দ্র কোনরকমে থার্ড ডিভিসনে, গ্রেস পেয়ে পাশ করে। বলাবাহুল্য, শান্তির এই সফলতাকে কান্তি ও তার পুরুষ বন্ধুরা সমালোচনা ও নিন্দার দৃষ্টিতে দেখেছে। এরপর সৌভাগ্যবশতঃ এক উচ্চশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের সঙ্গে শান্তির বিবাহ হয়ে যায়। স্বামী বিদেশে পড়তে গেলে সেই অবসরে শান্তি পুনরায় ঘরে বসে সাহিত্য চর্চায় মনোযোগী হয়। ছেলেবেলা থেকেই তার গল্প, কবিতা লেখার ঝোঁক ছিল, কাজেই এ ক্ষেত্রে সে অনায়াসেই প্রকৃত প্রতিভার পরিচয় দিল। কিন্তু ঘরেই শান্তিকে প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হল। কান্তি বোনের এই বিকাশ ও খ্যাতি মেনে নিতে পারত না। তার নিজের লেখা কবিতা উৎকৃষ্ট মানের না হবার ফলে সে শান্তির কবিতা চুরি করে সভায় নিজের বলে পাঠ করত। এরপর প্রতিযোগিতার জন্য পত্রিকায় পাঠানো শান্তির গল্প চুরি করে কান্তি চরম হীনমন্যতার পরিচয় দেয়। এভাবে প্রকৃত প্রতিভা ও ক্ষমতার অধিকারিণী হয়েও সংকীর্ণমনা, অনুদার পুরুষের ছলা-কলা, কৌশলের কাছে শান্তিকে হার মানতে হয়েছে। সে যুগে মেয়েরা যে ব্যক্তিত্ব বিকাশে পরিবারের কাছেই প্রধান বাধা পেত এ গল্পে যেন লেখিকা তার বাস্তব পরিচয় তুলে ধরলেন।

নারীর জীবন ভাবনা প্রকাশে একটি সার্থক ছোটগল্প 'তিনটি দৃশ্য'। উনিশ শতকে নবজাগরণের ফলে সমাজ ও পরিবারে নারীর জীবনচর্যায় যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল তার ইঙ্গিত রয়েছে এ গল্পে। এখানে বাঙালী গৃহবধূর বিচিত্র প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলবার অসাধারণ ক্ষমতার কথা পাই। যেমন -- "কেবল বালিকা বধূ কেন, সেদিন দেখিলাম, পঞ্চাশ বছরের এক বর্ষিয়সী, শিবপূজা না করিয়া যিনি জলগ্রহণ করেন না, মেম দেখিলে অস্পৃশ্য বস্তু

বিবেচনায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া আট হাত দূরে সরিয়া দাঁড়াইতেন , আজ তিনি অসংকোচে স্বামীর সহিত বিলাতযাত্রা করিলেন । পূজা ছাড়িলেন , গাউন ধরিলেন , টেবলে বসিয়া খানা খাইতে সুরু করিয়া দিলেন । ইহাকে তাজ্জব ব্যাপার বলিব না কি ?'' একদিকে প্রচলিত সংস্কার ও বিশ্বাস অপরদিকে প্রগতিশীল মনোভাবের সমন্বয় লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবী এ গল্পে নারী চরিত্রের মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছেন ।

আর এভাবেই গল্পে সবার আশ্চর্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে 'ধনিষ্ঠা' নামের মেয়েটি । এক উচ্চবংশীয় ধনীগৃহে জমিদার পুত্রের সঙ্গে কুলবতী কন্যা ধনিষ্ঠার বিয়ে হয়েছিল । বিবাহের দশ বছর পরও ধনিষ্ঠাকে তার শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা সংস্কারবশতঃ পিতৃগৃহে আসতে দেয়নি । শ্বশুরের মৃত্যুর পর কুসংসর্গ দোষে ধনিষ্ঠার স্বামী লম্পট মাতালে পরিণত হয় । ধনিষ্ঠার গায়ের গহনাও কেড়ে নিতে চায় সে । শাশুড়ির আদেশে ধনিষ্ঠা সেই গহনা নিয়ে বাপের বাড়ী চলে আসে । উদ্ধত স্বামী সেখানে এসেও স্ত্রীকে অকথ্য অপমান করে । এর পরই তেজোময়ী দৃপ্ত-দেবী সদৃশ ভঙ্গিতে ধনিষ্ঠা প্রতিবাদ করে । পত্নীর এই শক্তিময়ী রূপ দর্শনে অনুতপ্ত কণ্ঠে পদপ্রান্তে নতজানু হয়ে স্বামী বলে -- ''বুঝেছি , আমি বুঝেছি , কি পাষণ্ড , কি নরাধম আমি । বুঝেছি তবুও তুমি ক্ষমা কর , দেবী , আমাকে ত্যাগ কর না , পায়ে রাখ , আশ্রয় দাও । আমাকে পাপ পঙ্ক হতে উদ্ধার কর ।'' এভাবে এ গল্পে নারীর শক্তিময়ী ব্যক্তিত্বকে পুরুষ স্বীকৃতি জানিয়েছে ।

জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞা , নানা জনহিতকর কল্যাণকর্মে নিযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী পুরুষ প্রধান সমাজে একজন লেখিকারূপে ঘরের কথা ও নারীর মনের কথা অত্যন্ত সহানুভূতি ও হৃদয়াবেগের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন । বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ও প্রবন্ধে তিনি প্রগতিশীল ভাবনা ও নারী মুক্তির কথা বললেও তাঁর ছোটগল্পে নারীরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সংসার সীমানার পরিবেষ্টনেই পরিচালিত হয়েছে । যদিও কোথাও কোথাও

অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে তারা। স্বর্ণকুমারী দেবীর গল্পে বেশীরভাগ নারীরাই প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ, ঐতিহ্য ও প্রেমে উদ্বুদ্ধ। তাই স্বতন্ত্র আত্মপ্রকাশের চেয়ে সংসারের সেবায়, ভক্তিতে, আত্মত্যাগে ও কর্তব্যকর্মে এরা উজ্জ্বল। স্বামী, সংসার ও পরিবারের চার দেওয়ালের গন্ডিতে এসব নারীর জীবন আবর্তিত। আসলে উনিশ শতকে বাঙলা দেশের সমাজে নারীর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব, অধিকার ও আত্মমর্যাদার কথা খুব বেশী স্বীকৃতি পায় নি। নবজাগরণের পর থেকে নারীর ব্যক্তিত্ব একটু একটু করে সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। তাই তাঁর লেখা গল্পে নারীর স্বাধীন স্বতন্ত্র জীবন পরিচয় পাই না।

প্রাক-রবীন্দ্র যুগের অপর এক উল্লেখযোগ্য গল্পকার নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪০)। ইনি চার মাস 'প্রদীপ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি বহু বিষয়-বৈচিত্র্যে পূর্ণ অসংখ্য গল্প লিখলেও তাঁর কয়েকটিমাত্র গল্পে নারীর জীবনের পরিচয় পাই। এসব গল্পেও নারীকে স্বাধীন স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তায় বিকশিত হতে দেখি না। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হল -- 'দুইবার', 'ঘরের অলক্ষ্মী', 'মায়াবিনী', 'ভৈরবী', 'শ্যামার কাহিনী', 'চিরকুমারী', 'নূতন বাড়ী', 'মুক্তি', 'ছোটবৌ', 'লক্ষহীরা' ইত্যাদি।

'ঘরের অলক্ষ্মী' গল্পটি 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় ১২৯৬ সনে প্রকাশিত। কলকাতা নিবাসী ধনী ব্যবসায়ী হরিহর মুখোপাধ্যায়ের পাঁচ-ছয় বছরের কন্যার করুণ জীবনকথা ব্যক্ত হয়েছে। এই ছোট মেয়েটি জন্মের সময় অত্যন্ত সুন্দর হওয়ায় তার মা তার নাম রেখেছিল -- 'ভুবনমোহিনী'; কিন্তু বড় হয়ে সে অস্বাভাবিক ও প্রতিবন্ধী হয়ে যায়। সবাই তাকে, অলক্ষ্মী বলে মনে করে, কারণ -- 'সে হাবা-কালা, কিছু বলতেও পারে না, কিছু শুনতেও পায় না।' এমনকি তার পরিবারের লোকেদের বিশ্বাস ওর জন্মের পর থেকেই ঘরের বাঁধা লক্ষ্মী চঞ্চলা হয়েছে। মেয়েটির বাড়ির লোকেরাও তার

ওপর সহানুভূতিহীন। সবার কাছে লাঞ্ছনা, অপমান কটূ-কথা শুনে সংসারে মেয়েটি একান্ত অনাকাঙ্খিতের মতো বেঁচে ছিল। অবশেষে তার কঠিন পীড়া হল, এবং তাতেই তার মৃত্যু হল। এভাবে বোবা কালা মেয়েটির বোঝা সংসার থেকে অপসারিত হলেও সমাজের মানুষের মনের কুসংস্কারের বাধা মুক্ত হল কি? গল্পের শেষে লেখকের সেই জীবন-জিজ্ঞাসা ও সহানুভূতি পরিস্ফুট -- 'ঘরের অলক্ষ্মী বিদায় হইল। ঘরের লক্ষ্মী ফিরিলেন কি? তা জানি না।'

এক বিগত যৌবনা, দরিদ্রা, পিতৃমাতৃহীনা, অবিবাহিতা নারী তার বঞ্চিত হৃদয়ের আক্ষেপ, অস্থিরতা, যন্ত্রণা ও জিজ্ঞাসাকে নিজ মুখে বর্ণনা করেছে 'চিরকুমারী' (ভারতী, ১২৯৬, ভাদ্র) গল্পটিতে। প্রতিবেশীদের দয়ায় আশ্রিতা মেয়েটি গল্পের শুরুতেই জানায় -- 'বিবাহ হৈল না। কিছুদিন পরে বিবাহের আর কোন কথা উঠিত না। কুলীন কন্যার ফুলগাছের সঙ্গে যেমন বিবাহ হইত, আমার তাহাও হইল না। আমি জগতে একা আসিয়া একাই আছি। বিবাহের সুখ বৈধব্যের দুঃখ কিছু জানি না। আমি একাকিনী।' এই বর্তমান জীবনের কথা বলতে গিয়ে সে তার অতীত জীবনের স্মৃতিতে ফিরে যায়। একসময়ে তারও রূপযৌবন, সৌন্দর্য, লাবণ্য সব ছিল। সে সময়ে এক দেবতুল্য যুবাপুরুষকে দেখে তার হৃদয় আকৃষ্ট হয়, তার চিত্ত বৈকল্য ঘটে। পরমুহূর্তেই সে জানে যুবকটি -- পশুবৃত্ত পাপিষ্ঠ, যুবতীদের সর্বনাশ সাধন-ই তার লক্ষ্য। কাজেই তার প্রণয় লাভ হয়নি। শুধু প্রেম নয়, এই ভাগ্যহীনা মেয়েটির জীবনের কোন আশা-আকাঙ্ক্ষাই পূরণ হয়নি। অথচ বিশ্ব-সংসারের সর্বত্র মহামিলনের ঐক্য সূত্র ও নিয়মচক্র তার মনকে আরও উদাস করে তোলে। অসংখ্য জিজ্ঞাসায় সে মনে মনে বলে -- 'মায়ার মোহময় বন্ধন হইতে কে আমায় অন্তরিত করিল? নিয়মের শৃঙ্খলে বিশ্বচরাচর কে বাঁধিল? গ্রহগণ কেন সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে? বিশ্বের ভিতরে কেহ স্বতন্ত্র থাকে না কেন? একে কেন অপরের উপর নির্ভর করে। কেহ কি আমায় স্পর্শ করিবে না, কেহ কি আমার মুখ চাহিবে না?' এভাবে মেয়েটির জীবন সম্পর্কে গভীর সংশয় ও বিশ্বাস

সম্বলিত প্রশ্নেই গল্পটি সমাপ্ত -- ''প্রণয় অথবা স্নেহ , ধর্ম অথবা শান্তি কি আসিবে , কে আসিবে তাহা জানি না , কিন্তু এ হৃদয়ের শূন্য পূরিবে । -- তবে কি ইহজগতে আমার জন্য স্থান নাই ?'' এ সমস্ত প্রশ্নের কোনো উত্তর যেন সমাজ পরিস্থিতিতে তখনও তৈরী হয় নি , কারণ সে সময়ে সমাজে বিবাহ ব্যতীত নারীর জীবনাচরণে অন্য কোনো উপায় ছিল না । তাই এক অবিবাহিতা , জীবনসুখ বঞ্চিতা , অসহায় , অসুখী নারীর কণ্ঠে অজস্র প্রশ্নেই লেখক 'চিরকুমারী' গল্পের করুণ পরিণতি তুলে ধরেছেন।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'ভৈরবী' গল্পটি 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় ১২৯৬ সনে শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত । গল্পটিতে সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিতে নারীর মহিমা প্রকাশিত হয়েছে । মধ্যযুগের শেষ আলোকরশ্মি এই যুদ্ধের পরেই বিলীন হয়েছিল । বহু ছোট ছোট রাজা , রানী সকলের-ই ভাগ্য এই যুদ্ধের ফলে পরিবর্তিত হয়েছিল । ভৈরবীর ভাগ্য পরিবর্তনের মূলে এই বিদ্রোহের প্রভাব লক্ষণীয় । এই ভৈরবী আজমগড়ের রানী চন্দা । ইংরেজের সঙ্গে বড় যুদ্ধ করে সে রাজ্য হারিয়ে পলাতকা অবস্থায় কাশীতে আশ্রয় নিয়েছে । ভৈরবী সংসারের সাধারণ নারী নয় । তার দেশপ্রেম , বীরত্ব ও দুঃসাহসিক আত্মত্যাগের মহিমা তাকে পুরুষ যোদ্ধার সমকক্ষ করে তুলেছে । লেখকের বর্ণনায় তার এই নারীত্বের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত । -- ' ভৈরবী তরুণী -- অপূর্ব সুন্দরী , মাথায় জটা , জটা পরিবার পূর্বে বোধ হয় সে কেশরাশি বড় সুন্দর ছিল । বোধ হয় , সেইচুলের মাঝখানে মুখখানি বড় শোভা পাইত । মাথায় জটা পড়িয়াও রূপ কমে নাই কিন্তু এখনকার সৌন্দর্য্য কোমল নহে । ভৈরবী তেজস্বিনী , অঙ্গ হইতে যেন অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হইতেছে । সর্ব্বাঙ্গ গেরুয়ায় আবৃত । হাত , পা , মাথা কেবল দেখা যাইতেছে ।' একদিকে নারীর কোমল সৌন্দর্য , অপর দিকে কঠিন কর্তব্য কর্ম তথা দেশপ্রেমের উদার আদর্শ ভৈরবীকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছে ।

'মুক্তি' ১২৯৮ সনে অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত নগেন্দ্রনাথের একটি সার্থক ছোটগল্প । এ গল্পে নারীর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ প্রকট নয় । এ গল্পের নায়িকা যুবতী নারী জ্বালাময়ী , শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন , বহুল বিষয় সম্পত্তির অধিকারী এক অবিবাহিতা রমণী । একাকিনী জীবন সমুদ্রে সঠিক পথের সন্ধান না পেয়ে সে গভীর দুঃখে হিমালয়ের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আত্মহত্যা করতে চায় । তাকে সেই মুহূর্তে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ যুবক উদ্ধার করে । জ্বালাময়ী কৃতজ্ঞতা বশতঃ এই উদ্ধারকর্তা পুরুষটিকেই তার 'জীবনসর্বস্ব' বলে গ্রহণ করে । আবার এই জ্বালাময়ীর রূপলাবণ্যে ব্রাহ্মণ যুবকটির মন আকৃষ্ট হয় । কিন্তু বিবাহের পূর্বেই যুবকটি সন্ন্যাসী মহাপুরুষের সান্নিধ্যে ধর্মগ্রহণ করায় তার মন দ্বিধাণ্বিত হয় । -- ''একদিকে অজ্ঞাতবাসী কামচর অসীম ক্ষমতাশালী মহাপুরুষ , অপরদিকে চিরদর্শনাভিলাষিণী পরমাময়ী রমণী ।'' এই দুই বিপরীত আদর্শের সংঘাতে নায়কের মন বিক্ষুব্ধ হয় । সন্ন্যাসীর আদেশ উপেক্ষা করে যুবকটি জ্বালাময়ীকে বিবাহ করে । জ্বালাময়ীর এই বিবাহিত জীবন সুখের হয় না , কারণ মহাপুরুষ কর্তৃক ভৎর্সিত নায়ক সংসার ত্যাগের সংকল্প নেয় । জ্বালাময়ী স্বামীর এই কঠিন বাক্য শ্রবণে মর্মাহত হয়ে বলে -- ''আমাকে যদি ত্যাগ কর , তাহা হইলে তোমার সম্মুখে মরিব ।'' এভাবে সে মহাপুরুষের বাণীকে অগ্রাহ্য করে স্বামীর সঙ্গসুখ কামনা করে । কিন্তু এ সংসারে মুক্তিকামী , স্বাধীন , স্বেচ্ছাচারী পুরুষের কাছে শেষ পর্যন্ত নিরুপায় স্ত্রীকে হার মানতে হয় । স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে স্বামী নিষ্ঠুরভাবে বলে -- ''তুমি লোকালয়ে ফিরিয়া যাও । আমার আশা ত্যাগ করো । আমার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না ।''

'নূতন বাড়ী' গল্পটি 'সাহিত্য' পত্রিকায় বৈশাখ ১২৯৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় । গল্পে মোক্ষদা এক মালীর বিধবা পূর্ণযুবতী কন্যা । ধনী পুরুষ মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী তার যৌবন সৌন্দর্যে মুগ্ধ । মোক্ষদা তাকে মনে মনে পছন্দ করে কিন্তু সামাজিক নিয়মে প্রচলিত ধর্ম মেনে মহেন্দ্রনাথকে বিবাহ করতে চায় । কিন্তু মহেন্দ্রনাথ বিধবা বিবাহে

অরাজী। কাজেই দৃঢ়ভাবে মোক্ষদা তাকে বলে -- ''যেদিন আমাকে বিবাহ করিবে সেই দিনই যাইব।'' তার এই মানসিক দৃঢ়তা ও সাহসিকতা গল্পে প্রশংসনীয়। যদিও মোক্ষদার নারীমনের রহস্যময় আবরণ গল্পের কার্যকারণ সম্পর্কের অভাব এনেছে। মোক্ষদা এ গল্পে হিন্দু নারীর সনাতনী সংস্কারেই বিশ্বাসী। তাই বিবাহ বহির্ভূত প্রণয়কে সে সামাজিক কারণে মেনে নিতে পারে না।

'লক্ষহীরা' গল্পটি ১৩০৫ সালে 'প্রদীপ' পত্রিকায় আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে লক্ষহীরা নামে একটি নটীর এক ছেলেকে ভালোবাসার ও স্নিগ্ধ সুন্দর বুভুক্ষু মাতৃত্বের হাহাকারকে লেখক আন্তরিক ভাবে তুলে ধরেছেন। গল্পের শেষে উল্লেখযোগ্য এই উদ্ধৃতিটি -- ''আগে নরম সুরে, ধীরে ধীরে গানের কথাগুলি স্পষ্ট সুরের তার যেন প্রাণ থেকে টানা, যে শোনে, মর্মে মর্মে লাগে। প্রার্থনার একটি গান, অনুতপ্ত হৃদয়ের ব্যথা, মার্জনার জন্য ব্যাকুলতা, কণ্ঠ ক্রমে মুক্ত হল, ঐটুকু ঘরে যেন গলা ধরে না। এমন প্রাণের আকুলতা, যেন দেবতা সাক্ষাতে, যেন তিনি নিজে সব শুনছেন। সেই ঘরখানি যেন দেব মন্দির হয়ে উঠল।''

'অলকা' ১৩০০ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত। গল্পে অলকা অজনালা রাজ্যের রাজা বিক্রমের একমাত্র কন্যা। কঠিন অসুস্থতার জন্য চিকিৎসক অলকাকে দীর্ঘকাল পর্বতে থাকার পরামর্শ দেয়। রাজকীয় সুখ - ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করে সে তার দরিদ্র জ্যাঠার কাছে আশ্রয় নেয়। এখানেই তার সঙ্গে মৃগয়াসক্ত ক্ষত্রিয় যুবক প্রতীপের পরিচয় ঘটে। প্রতীপের পিতা নিকটস্থ পর্বত অঞ্চলের সংগতিপন্ন জমিদার। এই যুবকটির সংস্পর্শে অলকার মনের ভাব পরিবর্তন ঘটে। তারা পরস্পরকে বিবাহ করতে চায়। তাদের পিতা-মাতা এই বিবাহে বাধা দিলেও এই দুই ক্ষত্রিয় যুবক-যুবতীর প্রেমের পথে সব বাধাই অপসারিত হয়। প্রেমের ঐশ্বর্যে পর্ণকুটিরেই

তারা মহামিলন-স্বর্গ রচনা করে তোলে। প্রেমে আত্মত্যাগে, বীরত্বে এ গল্পের নারী এভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'শ্যামার কাহিনী' ও 'ছোটবৌ' গল্পদুটিতে নারীর ঘরোয়া সাংসারিক রূপ চিত্রিত হয়েছে।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত অনেকগুলো গল্প লিখলেও ছোটগল্প হিসাবে সেগুলো সার্থক নয়। বিষয়বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ বহু গল্প লিখলেও সেগুলো মূলতঃ রোমান্সধর্মী, আবার কোন গল্পে নারীর জীবনকথা প্রকাশিত হলেও এসব নারী চরিত্র conventional, স্বতন্ত্র বর্জিত। তাদের মধ্যে অস্পষ্টতা, জীবনীশক্তির অভাব ও কথাবার্তায়, আচার ব্যবহারে জীবনের মূল সুর ধরা পড়েনি। তুলনামূলকভাবে স্বর্ণকুমারীদেবীর নারী চরিত্ররা অনেক স্পষ্ট ও গভীরভাবে চিত্রিত। কাজেই রবীন্দ্রনাথের গল্পেই আমরা প্রথম সার্থকভাবে নারী চরিত্রের বিচিত্র বাস্তব জীবনকে দেখতে পাবো। এ সমস্ত গল্পে নারীর সমাজ সংস্কার ও সনাতনী বৈশিষ্ট্য বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। কোনো কোনো গল্পে নারীর অসহায়, অবরুদ্ধ অবস্থার চিত্র প্রকাশিত হলেও নারীর নিজস্ব ভাবনা ও ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল উপস্থিতি এ সমস্ত গল্পে প্রকাশ পায় নি। যথার্থ অর্থে স্বর্ণকুমারী দেবী বা নগেন্দ্রনাথ কেউ-ই ঠিক কোনো আধুনিক গল্প লেখেন নি -- তাঁরা প্রকৃতপক্ষে 'আখ্যানক' লিখেছেন, গল্প বলতে চেয়েছেন -- গল্পের মধ্যে খণ্ড খণ্ড মুহূর্তকে ধরে রাখতে চাননি, বা, অনিঃশেষ ব্যঞ্জনার মধ্যে গল্প শেষ করেন নি অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের গল্পের মতো সূচনা বা সমাপ্তি এখানে আমরা আশা করতে পারি না। কারণ বাংলা ছোট গল্পের প্রথম সার্থক শিল্পী-ই রবীন্দ্রনাথ। তবে ছোটগল্পের রূপকে একটা সুনির্দিষ্ট বন্ধনে বেঁধে দেওয়া চলে না, ছোটগল্পে জীবনের বিচিত্র রূপ প্রকাশিত হয়। জীবনের বিচিত্র ঘটনা সমান ব্যঞ্জনাময় নয়। তাছাড়া সব ছোটগল্পই সমানভাবে খণ্ড হয়েও অখণ্ডতার স্বাদবাহী নাও হতে পারে। তবু স্বর্ণকুমারী দেবী বা নগেন্দ্রনাথ

গুপ্তের গল্পে নারী জীবনের যে বাস্তব পরিচয় ফুটে উঠেছে বাংলা ছোটগল্পের আবির্ভাব পর্বের নারীভাবনার পরিচয় অন্বেষণে তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথের মহান দৃষ্টিভঙ্গি ও কল্পনাশক্তিতে নর নারীর বিচিত্র জীবন ও হৃদয়রহস্যের যে অতল গভীরতার রূপ ও তার বাস্তব পরিচয় ফুটে উঠেছে তা যেমন অসাধারণ তেমনি স্বতন্ত্র। বিশ্বকবির স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা গল্পসমূহের সঙ্গে স্বর্ণকুমারী দেবী ও নগেন্দ্রনাথের নারীভাবনার পরিবর্তন তাই সহজেই লক্ষ্যণীয়।

বস্তুতঃপক্ষে বাঙলা ছোটগল্পের যথার্থ প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথ (১২৬৮ - ১৩৪৮)। ইংরেজী shortstory -র অনুসরণে 'ছোটগল্প' নামকরণও রবীন্দ্রনাথেরই অবদান। রবীন্দ্রপ্রতিভার স্পর্শেই বাঙলা ছোটগল্প শৈশব থেকে যেন যৌবনে পা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলির রচনাকাল ১২৮৪ সাল থেকে ১৩৪৮ সাল পর্যন্ত। এই সুদীর্ঘ সময়ে প্রায় চুরানব্বইটি গল্প রচিত হয়। কারণ সব গল্পই ছোট গল্প হিসাবে বিবেচিত হয় নি। কোনোটি খসড়া বা গল্পের কাঠামো রূপে থেকে গেছে। মহৎ লেখার লক্ষণই এই যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বলতা বাড়ে। আর আলোচ্য গল্পগুলি সুদীর্ঘ সময়ের প্রেক্ষাপটে লেখা। সাধারণ নিয়মে দেখা যায় যে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রক্ষণশীলতা বাড়ে। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যে দেখব বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সংস্কারমুক্ত ও প্রগতিবাদী হয়েছেন। সাহিত্যসৃষ্টিতে তিনি মধুসূদনের মতো হঠাৎ করে আমূল পরিবর্তন আনেন নি, যেহেতু তাঁকে বহুদূরের পথ পরিক্রমণ করতে হয়েছে, তাই তিনি অতি ধীরে এগিয়েছেন। সমাজের চলতি প্রথাকে মুচড়ে ভেঙে আশ্চর্য কিছু নতুন করার উদ্যমও রবীন্দ্রসাহিত্যে নেই; তাঁর পথ নিশ্চিত বিবর্তনে।

দীর্ঘ সময়ে লেখা অজস্র ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ নারীকে কেন্দ্র করে নানান ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন, গল্পে কখনও গ্রামজীবন

এসেছে কখনও শহরজীবন এসেছে। কখনও নানা সংস্কার ও শোষণে আবদ্ধ নারীর জীবন-যন্ত্রণার চিত্র ফুটে উঠেছে। কখনও সামাজিক নানা প্রথা যা ব্যাধির মতো জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে -- সে প্রথার বিরুদ্ধে নানা ভঙ্গিমায় প্রতিবাদ প্রকাশ পেয়েছে। কোথাও পুরুষ শাসিত সমাজে অমর্যাদা ও মানুষী স্বীকৃতিহীনতায় ব্যক্তিত্বময়ী নারী প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছে। কোথাও আবার স্বামীর আদর্শ রক্ষায় নারী নীতি তথা দেহগত পবিত্রতা বিসর্জন দিয়েছে। এভাবে বিভিন্ন গল্পের মধ্যে নারীরূপকে রক্ষণশীল ও তথাকথিত সনাতনী হিন্দুধর্মের আলোকে রেখে তার নানা পরিবর্তনের রূপ অঙ্কিত করেছেন।

বাংলাদেশের পটভূমিতে লেখা গল্পগুলিতে নারীর একান্ত বাস্তবায়িত জীবনচিত্রকে রবীন্দ্রনাথ ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর সুনিপুণ লেখনী শক্তিতে। এই ছোটগল্পগুলিতে আমরা দেখব মেয়েরা ঘাটের পার থেকে, রান্নাঘর ও অন্দরমহলের গতানুগতিক সংকীর্ণ সংস্কারপূর্ণ সীমাবদ্ধ জীবন পরিধি থেকে কিভাবে উঠে এসেছে ও ধীরে ধীরে বাইরের জগতের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে, আবার বাইরের জগতে বেড়িয়ে আসার ফলে কিভাবে তারা মুক্ত মানসিকতার অধিকারী হয়েছে, অর্থাৎ তারা মেয়ে থেকে নারী ও সর্বোপরি ব্যক্তি হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের নারী ভাবনা বিষয়ক গল্পগুলি থেকে এই বিবর্তনরেখাকে তুলে ধরা হবে।

১২৮৪ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় 'ভিখারিনী' গল্প প্রকাশের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের যাত্রা শুরু। এরপর ধাপে ধাপে ১৩৪৮ সালে (২২শে শ্রাবণ) মৃত্যু পর্যন্ত তিনি গল্প লিখেছেন। গল্পগুলি 'হিতবাদী', 'সাধনা', 'বঙ্গদর্শন', 'সবুজপত্র', 'প্রদীপ', 'প্রবাসী', 'বঙ্গভাষা', 'আনন্দবাজার', 'শনিবারের চিঠি', 'বিশ্বভারতী' ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্যের সামগ্রিক বিবর্তনে

'সবুজপত্র' পত্রিকার ভূমিকা অপরিসীম। ''সবুজপত্রে মুক্তি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ; অবিরলতায় যদিও কোথাও ফাঁক নেই , তবু নদীর স্রোত তীব্র বাঁক নিল এখানে ; 'সবুজপত্রের' আগে এবং পরে যেন দুই আলাদা রবীন্দ্রনাথকে আমরা দেখতে পাই। সে সময়ে পুরোনো কূল ছাড়লেন তিনি , বহুদিনের অনেক অভ্যাসের বেড়ি ভাঙলেন , যে-কূল ছেড়ে গেলেন সেখানে আর ফিরলেন না।'' (পৃঃ ১৫ , রবীন্দ্রনাথ কথা সাহিত্য : বুদ্ধদেব বসু , ৩য় সংস্করণ)। যেহেতু 'সবুজপত্র' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ সাহিত্যজীবনে বড়ো রকমের পরিবর্তন ঘটেছে তাই পর্ব বিভাজন রেখা হিসাবে 'সবুজপত্র'-এর সময়কালকে সামনে রেখে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র গল্পগুলিকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে আমার গবেষণার বিষয়টিকে নিম্নলিখিত অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা হবে --

'রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের ছোটগল্পে নারীভাবনার রূপ (হিতবাদী - সাধনা - ভারতী পর্ব -- ১২৮৪-১৩১৮)

'রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পর্যায়ের ছোটগল্পে নারীভাবনার রূপ (সবুজপত্র পর্ব -- ১৩২১-১৩২৪)

'রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের ছোটগল্পে নারীভাবনার রূপ (উত্তর-সবুজপত্র পর্ব -- ১৩৩২-১৩৪৮)

তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত নারীভাবনা বিষয়ক ছোটগল্পগুলির বিষয়গত আলোচনা করে , পঞ্চম অধ্যায়ে এক একটি পর্যায়ের গল্পে নারীভাবনা সম্পর্কিত যে বৈশিষ্ট্যগুলি ধরা পড়বে তা নির্দিষ্ট করে , তারই নিরিখে রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনার বিবর্তনকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।